সোনার তরী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণ

⊥⊥ ↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓
গান গেয়ে তরী বেয়ে/ কে আসে পারে! (৮+৫)

↓↓ ↓↓↓↓ ⊥⊥ ↓↓↓↓↓
দেখে যেন মনে হয়/ চিনি উহারে। (৫+৮)

↓↓ ↓↓↓↓ ⊥⊥
ভরা পালে চলে যায় (৮)

↓↓ ↓↓ ↓↓⊥⊥
কোনো দিকে নাহি চায়, (৮)

⊥⊥↓↓↓↓⊥⊥
ঢেউগুলি নিরুপায় (৮)

↓↓↓ ↓↓
ভাঙে দু ধারে - (৫)

↓↓ ↓↓↓↓⊥⊥ ↓↓ ↓↓↓
দেখে যেন মনে হয়/ চিনি উহারে।। (৮+৫)

➲ **বিশ্লেষণ:** ' সোনার তরী' কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণে দেখা যায়- কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর লয় বা গতি বিলম্বিত। উপরের সাত পঙক্তি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় কবিতাটি ৮ মাত্রার পূর্ণপর্ব ও ৫ মাত্রার অপূর্ণ পর্বে রচিত। কবিতাংশের **১**ম, ২য় ও ৭ম পঙক্তিতে দুটি করে পর্ব যার **১**ম পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৮ এবং ২য় পর্বের মাত্রা সয়খ্যা ৫। এছাড়া ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম পঙক্তিতে ৮ মাত্রার একটি পূর্ণপর্ব এবং ৬ষ্ঠ পঙক্তিতে ৫ মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্ব রয়েছে।

পাঠ বিশ্লেষণ

- **উৎস:** 'সোনার তরী' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা। এ কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা ও এটি। শতাধিক বছর ধরে কবিতাটি বিপুল আলোচনা ও নানামুখী ব্যাখ্যায় নতুন নতুন তাৎপর্যে অভিষিক্ত হয়েছে।
- **মূল বক্তব্য:** সোনার তরী একটি রূপক কবিতা। এখানে বর্ষাকালীন প্রতিকূল পরিবেশে ধান কাটতে যাওয়া এক কৃষকের অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছে। চারপাশে প্রবল স্রোতের বিস্তার, এমনই একখানি ছোটো খেতের মাঝখানে সোনার ধান নিয়ে অপেক্ষার প্রহর গুনছেন একন বিপন্ন কৃষক। আকাশের ঘন মেঘ আর ভারী বর্ষণে পাশের খরস্রোতা নদ হিয়ে উঠেছে আরও হিংস্র ও ক্ষিপ্ত। উদ্ভূত পরিস্থিতে নিঃসঙ্গ কৃষকের মনে দানা বাঁধতে থাকে অজানা আশঙ্কা। এমন সময় ভরা পালে সোনার তরী বেয়ে আসে এক রহস্যময় নেয়ে। কৃষকের তাকে চেনা মনে হয়। উৎকণ্ঠিত কৃষক তাঁর উৎপাদিত সোনার ধানের সবটুকু তুলে দেন নৌকায়। অবাক হয়ে তিনি দেখেন- নৌকায় ফসল ধরলেও তাঁর উৎপাদিত সোনার ধানের সবটুকু তুলে দেন নৌকায়। অবাক হয়ে তিনি দেখেন- নৌকায় ফসল ধরলেও তাঁর জন্য সেখানে বিন্দুমাত্র জায়গা নেই। পরিশেষে সোনার ধান নিয়ে তরী চলে যায় অজানা দেশে। শূন্য নদীতীরে অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে কৃষক দাঁড়িয়ে থাকেন একা। এমন চিত্রকল্পের আড়ালে এখানে অন্তর্লীন রয়েছে একটি জীবনদর্শন। আর তা হলো- মহাকালের স্রোতে অনিবার্যভাবেই মানুষ একসময় হারিয়ে যায়, যদিও তার কীর্তির মৃত্যু হয় না।
- **গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র:** কৃষক, মাঝি।
- **নামকরণ:** সোনার তরী কবিতাটির নাম করণ করা হয়েছে এর অন্তর দর্শনকে উপজীব্য করে। এ কবিতায় সোনার তরী কালাতীত ইতিহাস্বরূপ। শিল্পস্রষ্টা নিজে সেখানে স্থান না পেলেও ইতিহাস সৃষ্টিকর্ম স্থান পায় ঠিকই। কবিতার এই অন্তর্ভাবনাটি ফুটে উঠেছে সোনার তরীকে কেন্দ্র করেই। সে বিবেচনায় কবিতাটির নামকরণ যথার্থ।
- **রূপশ্রেণি:** সোনার তরী একটি রূপক কবিতা। এ কবিতায় রূপকের আড়ালে কবি এক দার্শনিক সত্যকে উন্মোচন করেছেন।
- **ভাষারীতি:** সাধু ও চলিত ভাষা।
- **ছন্দ:** সোনার তর কিবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর অধিকাংশ পঙ্ক্তি ৮+৫ মাত্রার পূর্ণ পর্বে বিন্যস্ত।

কঠিন শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা

গগন	আকাশ।
ঘন বরষা	বর্ষা হলো একটি ঋতু; কবিতায় বরষা শব্দটি প্রবল বৃষ্টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
ভরসা	নির্ভর, আস্থা, বিশ্বাস; এখানে এক কৃষকের ধান কেটে নদীর কূলে বসে থাকা নিয়ে সংশ প্রকাশ পেয়েছে।
পরপারে	নদীর ওপারে; এখানে মৃত্যুর পরের জীবনকে বোঝানো হয়েছে।
প্রভাতভেলা	সকাল বেলা।
নিরুপায়	যার অন্য কোনো উপায় নেই।
ক্ষণিক	ক্ষণকাল, অল্পসময়।
তরণী	নৌকা; এখানে নৌকা মহাকালের প্রতীক।
সোনার তরী	এখানে মহাকালের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।
গরজে	গর্জন করে।
ভারা ভারা	'ভারা' অর্থ ধান রাখার পাত্র। এরকম পাত্রের সমষ্টি বোঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে।
ক্ষুরধারা	ক্ষুরের মতো ধারালো যে প্রবাহ বা স্রোত।
খরপরশা	ধারালো বর্শা। এখানে ধারালো বর্শার মতো।
আমি	সাধারণ অর্থে কৃষক। প্রতীকী অর্থে শিল্পস্রষ্টা কবি।
আমি একেলা	কৃষক কিংবা শিল্পস্রষ্টা কবির নিঃসঙ্গ অবস্থা।
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা	ধানক্ষেতটি ছোট দ্বীপের আঙ্গিকে চিত্রিত। তার পাশে ঘূর্ণায়মান স্রোতের উদ্দামতা। নদীর 'বাঁকা' জলস্রোতে বেষ্টিত ক্ষেতটুকুর আশু বিলীয়ান হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে এ অংশে। 'বাঁকা জল' এখানে অনন্ত কালস্রোতের প্রতীক।
তরুছায়ামসী-মাখা	ওপারের মেঘে ঢাকা গ্রামটি যেন গাছের ছায়ার কালো রঙে মাখানো।
গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে	ক্ষুরের মতো ধারালো জলস্রোতে গান গাইতে গাইতে যে মাঝি পায়ের দিকে এগিয়ে আসছে, রবীন্দ্র-ভাবনায় সে নির্মোহ মহাকালের প্রতীক।
কোনো দিকে নাহি চায়	মহাকালের প্রতীক এই মাঝি নিরাসক্ত বলেই তার সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিপাত নেই।
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে	এই আগন্তুক মাঝি কৃষক বা শিল্পস্রষ্টা কবির হয়ত চেনা। কেননা, চেনা মনে হলেও কৃষক বা শিল্পস্রষ্টা কবির সংশয় থেকেই যায়।
ওগো, তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে?	নির্বিকার মাঝির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কৃষক বা কবির চেষ্টা। 'বিদেশ' এখানে চিরায়ত শিল্পলোকের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে	চিরায়ত শিল্পলোকে ঠাঁই পাওয়ার জন্যই কৃষকরূপী কবির ব্যাকুল অনুনয় এখানে প্রকাশিত।
আমার সোনার ধান	কৃষকের শ্রেষ্ঠ ফসল। ব্যঞ্জনার্থে শিল্পস্রষ্টা কবির সৃষ্টিসম্ভার।
আর নাই, দিয়েছি ভরে	ছোট জমিতে উৎপন্ন ফসলের সবটাই অর্থাৎ কবির সমগ্র সৃষ্টি তুলে দেওয়া হয়েছে মহাকালের স্রোতে ভেসে আসা সোনার তরী-রূপী চিরায়ত শিল্পলোকে।
থরে বিথরে	স্তরে স্তরে, সুবিন্যস্ত করে।
এখন আমারে লহো করুণা করে	ফসল বা সৃষ্টিসম্ভার তুলে দেওয়া হয়েছে নৌকায়। এখন ফসল বা সৃষ্টির স্রষ্টা স্থান পেতে চায় ওই মহাকালের নৌকায়।
ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোট সে	সোনার তরীতে মহৎ সৃষ্টিরই স্থান সংকুলার হয় কেবল। ব্যক্তিসত্তা ও তার শারীরিক অস্তিত্বকে

তরী	নিশ্চিতভাবে হতে হয় মহাকালের নিষ্ঠুর কালগ্রাসের শিকার।
শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি	নিঃসঙ্গ অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে আসন্ন ও অনিবার্য মৃত্যুর প্রতীক্ষার ইঙ্গিত। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "মহাকাল আমার সর্বস্ব লইয়া যায় বটে, কিন্তু আমাকে ফেলিয়া যার বিস্তৃতি ও অবহেলার মধ্যে। ... সোনার তরীর নেয়ে আমার সোনার ধান লইয়া যায় খেয়াপারে, কিন্তু আমাকে লয় না।"

কঠিন অংশের ব্যাখ্যা

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।

ব্যাখ্যা: 'গগন' শব্দের অর্থ- আকাশ আর 'গরজে' দ্বারা বোঝানো হয়েছে গর্জন করছে। আলোচ্য অংশে বর্ষা প্রকৃতির চিত্রকল্প ফুটে উঠেছে, যেখানে ভরা বর্ষায় আকাশে মেঘ ডাকছে। এমন পরিস্থিতিতে এক বিপন্ন কৃষক নদীর কূলে একা বসে আছে।

রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হলো সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা/ খরপরশা-

ব্যাখ্যা: 'ভারা' হলো ধান রাখার পাত্রবিশেষ। 'ক্ষুরধারা' শব্দের অর্থ- ক্ষুরের মতো ধারালো আর 'খরপরশা' দ্বারা বোঝানো হয়েছে ধারালো বর্শার মতো। ধান কাটা সম্পন্ন হওয়ার পর কৃষক ভারা (ধান রাখার পাত্র) ভর্তি করে ধান সাজিয়ে রেখেছেন। ঘোর বর্ষায় ভরা নদীর স্রোত যেন ধারালো বর্শার মতোই তীক্ষ্ণ হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।

ব্যাখ্যা: এখানে 'বাঁকা জল' বলতে মূলত মহাকালের স্রোতকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ছোটো খেতটি নদীর জলবেষ্টিত। উদ্দাম জলের ঘূর্ণায়মান স্রোতের কবলে পড়ে কৃষকের খেতটি যেকোনো মুহূর্তেই নদী গর্ভে বিলীন হতে পারে। নদীর জলের এই বিধ্বংসী অবস্থাটিকে বোঝাতেই কবি একে 'বাঁকা জল' বলেছেন।

তরুছায়ামসী-মাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা

ব্যাখ্যা: গাছের ছায়ায় যেমন একটা কালচে ভাব লক্ষ করা যায়, নদীর ওপারের গ্রামটিও মেঘে ঢাকা পড়ে তেমনই কালচে বর্ণ ধারণ করেছে।

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে!
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

ব্যাখ্যা: 'তরী' শব্দের অর্থ- নৌকা। আলোচ্য অংশে নৌকা বেয়ে এক মাঝির এগিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। কবির দৃষ্টিতে এই মাঝি নির্মোহ ও মহাকালের প্রতীক। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পভাবনায় আপন সত্তার বাইরে এক মহাশক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন, যাকে তিনি জীবনদেবতা বলে অভিহিত করেছেন। মহাকালরূপী এই মাঝি তারই প্রতিরূপ। সংগত কারণেই কৃষকরূপী কবির তাকে চেনা মনে হয়।

শুধু তুমি নিয়ে যাও
ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে।

ব্যাখ্যা: এখানে সোনার ধান বলতে মূর্লত কৃষকরূপী শিল্পস্রষ্টা কবির সৃষ্টিকর্মকে বোঝানো হয়েছে। নির্মোহ মহাকালের কাছে তাঁর আবেদন, ফসলরূপী তাঁর কর্মফল যেন মাঝির নৌকায় তথা মহাকালের পঙ্‌ক্তিতে স্থান পায়। কেননা, এতেই স্রষ্টার সৃষ্টিকর্মের সার্থকতা নিহিত।

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই- ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।

ব্যাখ্যা: ফসলরূপী কর্মফল পূর্ণ করে দেওয়ার পর কৃষকরূপী কবিও মাঝির নৌকা তথা মহাকালের পঙ্‌ক্তিতে ঠাঁই অর্থাৎ আশ্রয় চান। কিন্তু কৃষকরূপী কবি অবাক হয়ে লক্ষ করেন, তাঁর ফসল তথা কর্মফলেই মাঝির নৌকা ভরে গিয়েছে। অর্থাৎ মহাকালের পঙ্‌ক্তিতে কর্মফল স্থান পেলেও ব্যক্তিকবির সেখানে জায়গা হয় না।

গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র

➲ বাঁকা জলঃ এ কবিতায় 'বাঁকা জল' কালস্রোতের প্রতীক। এই কালস্রোত অবধারিতভাবেই সবকিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কবিতাটিতেও একইভাবে নদীর বাঁকা জলের উদ্দামতায় ছোটো খেতটির বিলীয়মান অবস্থা বর্ণনার মধ্য দিয়ে মহাকালের স্রোতের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

➲ সোনার ধানঃ কবিতাটিতে ' সোনার ধান' শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে প্রতীকী অর্থে। এখানে ' সোনার ধান' মূলত শিল্পস্রষ্টা কবির সৃষ্টিকের্মর সম্ভার। এ কারণেই ফলসরূপী ধানকে তিনি সোনার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

➲ শ্রাবণগগনঃ আমাদের দেশে আষাঢ়-শ্রাবণ এই দুই মাস বর্ষকাল। এ সময় ভারি বৃষ্টিপাত হয়। আকাশ মেঘমেদুর থাকে দিনের বেশির ভাগ সময়। ভরা বর্ষার এই সময়টিকে বোঝাতেই কবিতাটিতে কবি 'শ্রাবণগগন' শব্দটি ব্যভহার করেছেন।

➲ শূন্যঃ শূন্য বলতে এখানে কৃষকের নিঃস্ব ও রিক্ত অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে। কৃষক তাঁর উৎপাদিত ফসলের সবটুকুই তুলে দেন মাঝির নৌকায়। মাঝি তাঁর ফসল নিয়ে গেলেও তাঁকে গ্রহণ করে না। ফলে নিঃস্ব ও রিক্ত অবস্থয় বসে থাকতে হয় তাঁকে।

➲ কৃষকঃ এ কবিতায় কৃষক শিল্পস্রষ্টা কবির প্রতীক। এখানে কৃষকের উৎপাদিত ফসল মূলত কবির সৃষ্টিকর্ম। কবি জানেন, মহাকাল তাঁর সৃষ্টিকর্মকে গ্রহণ করলেও সেখান তাঁর ঠাঁই নেই, যেমনটি দেখা যায় এ কবিতার কৃষকের ক্ষেত্রে। কৃষক তাঁর উৎপাদিত ফসলের সবটুকু মাজির নৌকায় তুলে দেওয়ার পর সেখান তাঁর নিজের জন্য জায়গা থাকে না। মহাকালের নিয়মের কাছে ব্যক্তি মানুষের এই চিরন্তন অসহায়ত্বের দিকটিই কবি কৃষক চিরত্রের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। সংগত কারণেই কৃষক চরিত্রটি পাঠকমনকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করে।

➲ মাঝিঃ কবিতাটিতে 'মাঝি' মহাকালের প্রতীক। প্রথম দর্শনে এই মাঝিকে কৃষকের চেনা মনে হলেও এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত হতে পারেন না। ক্ষুরধারা কালস্রোত অতিক্রম করে মাঝির আগমন হয় কৃষকের ফসল তোলার উদ্দেশ্যে। আর সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার পর সে ফিরে যায় কৃষককে ফেলে রেখেই। বস্তুত, সময়ের চোরা স্রোতে ব্যক্তিমানুষ একসময় হারিয়ে যায়। কিন্তু তার মহৎ সৃষ্টিকর্মকে সবাই স্মরণ করে। আলোচ্য কবিতাটিতে মাঝি চরিত্রের মধ্য দিয়ে কবি এ সত্যটিই উন্মোচন করেছেন।